এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আত্মহত্যা প্রতিরোধ করুন

সাইফুন্নেসা জামান
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী

"আত্মহত্যা" এ কথাটি শুনলেই আমাদের অনেকের মন আঁৎকে উঠে। নিজের হাতে নিজের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি টেনে আনাটা কত যে কষ্টের তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটি আত্মহত্যা শুধু যে একটা জীবনের অবসান ঘটায় তা নয় বরঞ্চ এর সাথে সাথে তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া, ভেঙ্গে যায় তার বাবা-মা বা ভাই-বোনের স্বপ্ন। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনেরা হারিয়ে ফেলে তাদের প্রিয় মানুষটিকে। আত্মহত্যার কারণে দেশ ও জাতি হারায় এক অমূল্য সম্পদ। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারতো তা থেকে বঞ্চিত করে তার পরিবার, সমাজ এবং জাতিকে । গবেষণায় দেখা গেছে যে, সব বয়সী মানুষের মৃত্যুর প্রথম দশটি কারণের মধ্যে একটি হল আত্মহত্যা এবং তরুন ও কিশোর বয়সে মৃত্যুর প্রথম তিনটি কারণের মধ্যে একটি হল আত্মহত্যা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সাড়ে তিন বছরে চারজন ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। বেঁচে থেকে যে ছাত্রীরা জ্ঞান, মেধা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতার দ্বারা সার্বিক উন্নয়নে অনেক ভূমিকা পালন করতে পারতো অবিবেচকের মত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে তারা করলো পরিবার, দেশ ও সমাজের বিরাট ক্ষতি। কিন্তু কেন এ আত্মহত্যা ? যথাসময়ে আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে ও সহযোগীতার হাত বাড়াতে পারলে প্রতিরোধ করা যায় অনেক আত্মহত্যার ঘটনা। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি।

আত্মহত্যার প্রবণতা কোন স্বাভাবিক আচরণ তো নয়ই বরং তা একটি রোগ। এ রোগের লক্ষণগুলোকে যদি সনাক্ত করা যায় তবে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার তাড়না প্রতিরোধ করা যায়। এরূপ কিছু লক্ষণ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির মাথায় আত্মহত্যার বা মৃত্যুর চিন্তা বেশীর ভাগ সময়ে ঘুরতে থাকে। অনেকে আত্মহত্যার ইচ্ছার কথা বা পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্য ভাবে বলে থাকে । দিনের বেশীরভাগ সময়ে তাদের মন ভাল থাকে না। বিষণ্নতা হলো আত্মহত্যার একটি অন্যতম কারণ। তারা নিজেদের মূল্যহীন মনে করে ও অসহায় ভাবে। অনেকে পূর্বের চেয়ে বেশী মাত্রায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে । তারা ভীষণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে জীবনটা অর্থহীণ মনে হয় এবং জীবনের কোন লক্ষ খুঁজে পায় না। তারা মনে করে এক ফাঁদে আটকা পড়েছে এবং তাদের সমস্যার কোন সমাধান

নেই। তাদের কাছে আত্মহত্যাই সেই সমস্যার একমাত্র সমাধান। তারা পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে আগের মত মেশে না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। যেমন - কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমত যায় না । এমনকি আগে যে সমস্ত কাজ করে সে আনন্দ পেত তা-ও করা থেকে বিরত থাকে। সব কিছুতেই যেন প্রচণ্ড অনীহা। ফলে, সার্বিক কাজকর্মে ঘটে বিরাট অবনতি, তারা দঃশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে এবং দুঃশ্চিন্তার কারণে তাদেরকে অস্থির ও বিরক্ত দেখা যায়। তারা নানারকম ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে থাকে । তাদের খাওয়া ও ঘুম আগের থেকে কমে যায়। মৃত্যুর জন্য একটা প্রস্তুতি ব্যক্তির মধ্যে কাজ করে। নিজের ভীষণ পছন্দের জিনিস সহজে অন্যকে দিয়ে দিতে বা সম্পত্তি ও অন্যান্য জিনিস ও কাজ গুছিয়ে ফেলতে দেখা যায়। অনেককে হঠাৎ করে বেশ হাসিখুশি দেখা যায়। কেউ কেউ আত্মহত্যা করার কিছুদিন আগে প্রিয়জনদের সাথে দেখা করে আসে। আবার অনেকে ডাক্তারের কাছেও যায়।

আত্মহত্যা প্রবণ ব্যক্তির চিন্তা ভাবনায় একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাবের একটা ছাপ দৃঢ়ভাবে বাসা বাঁধার কারণে ব্যক্তির একান্ত নিজের সম্পর্কে ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য দেখা দেয়। তারা কোন ঘটনাকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ণ করতে পারে না এবং জীবনকে তারা ব্যর্থ ও বৈচিত্রহীন দৃষ্টিতে অবলোকন করে। বিকল্প, ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত চিন্তা করার ক্ষমতা না থাকায় তখন তারা আত্মহত্যার পথে নিজেকে নিয়োজিত করে। আত্মহত্যা করার পিছনে রয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সমষ্টিগত প্রভাব।

শৈশবে আত্মহত্যা করার মনেবৃত্তি বা বীজ রোপিত হয়ে যায় যদি শিশুর সাথে পিতামাতার বন্ধন স্বাভাবিক, সুন্দর, প্রাণবন্ত ও সুদৃঢ় না হয়। বিশেষ করে মায়ের সাথে শিশুর স্বতঃস্ফুর্ত সম্পর্ক থাকা দরকার । তা না হলে আত্মধারনা ও আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না। অন্যদেরকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে না এবং অন্যের সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে সমস্যা হয় এবং পারলেও ধরে রাখতে সক্ষম হয় না। ফলে যে কোন সময়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দ্বিধাবোধ করে না।

পিতামাতার মধ্যে সর্বদা কলহ-বিবাদ লেগে থাকলে বা বিচ্ছেদ হলে অথবা পিতামাতা উভয়কে শৈশবে হারালে অনেক শিশু নিরাপত্তাহীন বোধ করে। পরিবারের লোকজন বিশেষ করে পিতামাতা কর্তৃক অবহেলা ও অতিরিক্ত তিরষ্কার সন্তানের জীবনকে বৈচিত্রহীন করে তুলতে পারে। যদি কখনো সন্তান বুঝতে পারে সে পরিবারে তথা পিতামাতার কাছে অনাকাঙ্খিত বোঝাস্বরূপ তখন সে নিজেকে নিয়ে অনুতপ্ত ও লজ্জিত বোধ করে ও আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

কখনো কখনো পিতামাতা সন্তানের দক্ষতা, কৃতিত্ব, মতামত ও উৎসাহের মূল্যায়ন করে না বরং সন্তানের নিকট হতে ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত প্রত্যাশা করে এবং চাপের সৃষ্টি করে। তখন সন্তান চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হলে আত্মহত্যা করে মুক্তি পেতে চায়।

একজন ব্যক্তি যদি অকারণে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষনের শিকার হয় তখন সে মনে করে যে সমাজের লোকজন তাকে ভাল চোখে দেখছে না। তারা নিজের সম্পর্কে নীচু ধারণা পোষণ করে এবং মূল্যহীন ভাবে। তারা অনেক ক্ষেত্রে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

বেকারত্ব, দারিদ্র, সমাজিক সমর্থনের অভাব, সমাজিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি সমাজ থেকে উদ্ভুত চাপ আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অনেক সময় কাজ করে।

অনেক সময় পারিবারিক বা দাম্পত্য কলহ হলে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে, প্রেমে ব্যর্থ হলে, হঠাৎ করে চাকুরীচ্যুত হলে, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, যৌতুক দিতে না পারলে ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে পরাজয়কে মেনে নিতে না পারার কারণে অনেকে আত্মহত্যা করে থাকে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে?

- আত্মহত্যা প্রতিরোধে অভিভাবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শৈশব কাল থেকে পিতা মাতার সাথে সন্তানের একটা নিরাপদ, প্রাণবন্ত ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকা দরকার যেখানে স্নেহ ও শাসনের পাশাপাশি পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতি তথা আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা বিনিময়ের অর্থাৎ খোলাখুলি আলাপের সুযোগ থাকে। মা-বাবাকে বন্ধু হয়ে সন্তানের পাশে দাঁড়াতে হবে ও আশ্রয় দিতে হবে। আদর-সোহাগ দিয়ে সন্তানকে কাছে টেনে বোঝাতে হবে।
- শৈশবকাল থেকে ইতিবাচক আত্মধারণা ও আত্মবিশ্বাস গঠনে পিতামাতা এবং পরিবারের লোকজনের সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার।
- অবহেলা, উপেক্ষা ও অযথা অতিরিক্ত তিরষ্কার করা অনুচিত। এতে করে সন্তান নিজেকে পরিবার তথা পিতামাতার কাছে অনাকাঙ্খিত বা বোঝা মনে করবে না।
- দক্ষতা, মতামত ও উৎসাহের মূল্যায়ণ করা দরকার।
- বিকল্প পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানে, সৃজনশীলতার বিকাশে এবং গঠনমূলক আচরণে উৎসাহিত এবং যথাযথ প্রশংসা করতে হবে। সম্ভব হলে দক্ষতা ও উৎসাহ বিবেচনা করে পছন্দমত কাজ বা শিক্ষা

প্রদান করা উচিৎ। অন্যদিকে ধ্বংসাত্মক আচরণকে সর্বদা নিরুৎসাহিত করতে হবে।

- অতিরিক্ত প্রত্যাশা যেন সন্তানের উপর মানসিক চাপ না সৃষ্টি করে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। অনেক সময়ে অনেক সন্তান পারে না তার মা-বাবার সব স্বপ্ন পূরণ করতে। তাই বলে কি তার সব শেষ হয়ে যাবে? মা-বাবাকে আরও সঠিক সুবিবেচক হতে হবে।
- বিবাহিতদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সুন্দর দাম্পত্য জীবন বজায় রাখা দরকার। যৌতুককে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা উচিৎ।
- জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ খুঁজে দেখতে হবে। পরাজয় বা ব্যর্থতাকে মেনে নেবার মত মানসিকতা থাকতে হবে ও জীবনের একটি অংশ হিসেবে নিতে হবে। জীবনে যেমন জয় আসে তেমন পরাজয়ও আসতে পারে। পরাজয় এলে কেন জীবন বিসর্জন দিতে হবে? একই ভাবে বলা যায়, জীবনে প্রেম বা ভালবাসা আসতে পারে আবার ভালবাসা ভেস্তেও যেতে পারে। তাই বলে কেন সেই একজনের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে হবে? এত ছোট গণ্ডির মধ্যে নিজেকে কল্পনা না করে ও সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের বিশালতাকে অনুভব করতে হবে। একটা সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার কারণে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়া ঠিক হবে না।
- নৈতিকভাবে আত্মহত্যাকে মহাপাপ জেনে সর্বদা পরিত্যাগ করে চলতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আত্মহত্যা কোন সমাধান নয়। আত্মহত্যা পরাজয়। নিজে আত্মহত্যাকে ঘৃণা করুন ও মাথা নত না করে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বেঁচে থাকুন এবং নিজের যোগ্যতায় এগিয়ে যান। একই সাথে আত্মহত্যাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করুন। একজন আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি যদি তার বিষণ্নতার কথা এবং আত্মহত্যার চিন্তার কথা তার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয়জনদের সাথে আলোচনা করতে পারে তবে সে সাহায্য পেতে পারে ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে সক্ষম হতে পারে। কোন ব্যক্তির মাঝে আত্মহত্যার পরিকল্পনা আছে জানলে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ও মন দিয়ে তার কষ্টের কথা শুনতে হবে এবং কোনভাবে গোপন রাখা যাবে না। এ প্রবণতা রুখতে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবিরা (সাইকিয়াট্রিস্ট, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী) সাহায্য করতে পারেন। প্রয়োজনে নিজে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করুন এবং আত্মহত্যা প্রবণ ব্যক্তিকে এ সেবা নিতে উদ্বুদ্ধ করুন। একটি কথা মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে ওষুধ যথেষ্ট নয়। ওষুধের পাশাপাশি দরকার সাইকোথেরাপী। একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী সাইকোথেরাপীর মাধ্যেমে শিখিয়ে দিতে পারেন কিভাবে সে তার উদ্ভুত সমস্যা, চাপ ও সংকটকে মোকাবেলা করবে ও নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা সনাক্ত করে সংশোধনের চেষ্টা করবে। মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের দেশে আজও একটা কুসংস্কার কাজ করে বলে অনেকে এ সেবা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করে। এ সেবা গ্রহণ করে কোন লাভ হবে না এ চিন্তা করে অনেক হতাশাগ্রস্ত আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি এ সেবা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। তাদেরকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন যে, বিষণ্নতা চিকিৎসা করা সম্ভব, জীবন আরও সুন্দর করা সম্ভব, আত্মহত্যার অনুভুতিগুলো সাময়িক এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব, এবং এ ব্যাপারে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবিরা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের কথা শুনতে পারে ও দক্ষতার সাথে সমস্যা মোকাবিলায় সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারে। আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে হবে যে, আত্মহত্যার তাড়না নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সে তার প্রিয়জনকে বা কোন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবির কাছে যাবে বা ফোনে কথা বলবে এবং এ তাড়না প্রতিরোধ করবে।